শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে.....

সংখ্যা নির্দেশ ঃ 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৬৪ সংখ্যক কবিতা।

ইতিহাস প্রেক্ষিত ঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় সাম্রাজ্য আগ্রাসী ইংরেজ জাতির নির্মম অত্যাচার ও শোষণের প্রতিবাদে কবির এই কবিতা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে আসে শিল্প বিপ্লবের জোয়ার। অভবনীয় ভাবে ঘটে উৎপাদন বৃদ্ধি। ইংরেজদের শক্তি আরো বাড়ে। অনুন্নত দেশগুলোর উপর উপনিবেশ দখল নিয়ে লড়াই শুরু হয়। ইংল্যান্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা, ইটালি প্রভৃতি দেশ এই প্রতিযোগিতায় নামে। অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা ঘটাতে উক্ত দেশগুলির মধ্যে শুরু হয়ে যায় এক আর্ন্তজাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যার সাম্রাজ্য যত বড় হবে তার শক্তি ও পদমর্যাদা তত বাড়বে। তাই রাজনৈতিক স্বার্থ বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে মিলে যায়।

Scanned with CamScanner

শুরু হয় যুদ্ধ, দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়োর যুদ্ধ ও চীনের বক্সার যুদ্ধ। জাতিপ্রেমের নামে নিষ্ঠুর লড়াই অন্যদেশের স্বাধীনতা হরণ করে। এই যুদ্ধ সমূহে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা ছিল ইংরেজদের। যারা ভারতেও তাদের উপনিবেশে পরিণত করেছিল। সচেতন চিত্ত রবীন্দ্রনাথ এই পরিস্থিতিতে উতলা হয়ে পড়েছিলেন, তারই নিদর্শন পাওয়া যায় আলোচ্য কবিতাটিতে।

মূলভাব ঃ এই কবিতার মূলভাব এই সংঘাতের প্রেক্ষাপটে, জাতিপ্রেমের নামে বিবাদের অন্যায় দেখে বিক্ষুব্ধ কবিচিত্ত প্রকাশ পেয়েছে।

ভাষা ও ছন্দ বিচার ঃ কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দে রচিত একটি চতুর্দশপদী কবিতা। প্রতি চরণে ১৪টি অক্ষরের সমাবেশে পংক্তিগুলি তৈরী হয়েছে। এই ১৪টি মাত্রা আবার ৮ ও ৬ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই ধরণের কবিতার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আগাগোড়া কবিতাটি এক বিশিষ্ট ভাবকে বজায় রাখে। আবার এর আঙ্গিক ও আঁটোসাটো রূপে আগাগোড়া কবিতার ভাবকে তুলে ধরে। শুরু থেকে ঘটনা ক্রমশ পরিণতির দিকে এগোতে থাকে। এবং ঐ ১৪ পংক্তির মধ্যেই কবিতার সমস্ত বিষয়বস্তু ও ভাব কবি পাঠকের সামনে তুলে ধরেন।

সারসংক্ষেপ ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিনগুলিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবেশ দখলের লড়াই শুরু হয় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ওলন্দাজ বাহিনী ও দুর্বল বুয়োর জাতিদের সঙ্গে। হিংসায় উন্মত্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি যেভাবে দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা দেখে কবির মন সাম্রাজ্যবাদকে ধিক্কার জানিয়েছিল। কখনো ধর্ম, কখনো উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবের মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্কীর্ণ অভিপ্রায় ফুটে উঠেছে। একেই কবি বলেছেন, 'ভদ্রবেশী বর্বরতা।' নীতিবোধ, লজ্জা,ভয় সবকিছুকে ভাসিয়ে দিয়ে তারা নির্লজ্জের মত কাড়াকাড়ি করেছে অপরের রাজ্য নিয়ে। শ্মশান কুকুরদের মতন তাদের এই নির্লজ্জতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি মনে করেন, এইভাবে যদি ভাগাভাগি, দলাদলি চলতে থাকে তাহলে মানবজাতি, মানবসভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য।

Scanned with CamScanner

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

❑ **সংখ্যা নির্দেশ ঃ নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের ৩০ সংখ্যক কবিতা।**

❑ **ইতিহাস প্রেক্ষিত ঃ** মানবজীবনের লক্ষ্য মোক্ষ লাভ। সেই প্রাপ্তির উপায় হিসাবে ভারতীয় পন্ডিতেরা কঠোর তপস্যা, ত্যাগ, বৈরাগ্যকে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আধুনিক যুগে এসে মানুষ তা ঠিক গ্রহণ করতে পারে না। বিপরীতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত ধরে চূড়ান্ত ভোগবাদের জীবনযাপন প্রণালীও তখন সমাজে উপস্থিত। সময়ের এই প্রেক্ষিতে কবি মনে জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয়ে ওঠে যা তাঁর আত্মচেতনায় আত্মবিশ্লেষণেরই নামান্তর।

❑ **মূলভাব ঃ** সকল বন্ধনের বাইরে গিয়ে বৈরাগ্য গ্রহণ করে নয়, কবিতাকার সব বন্ধনের মধ্যে উপস্থিত থেকেই মুক্তির স্বাদ প্রত্যাশী। সংসারের সাধারণ আনন্দেও তাঁর কৌতূহল। ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসাবে এই সমাজেই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চান, গুণের আলোয় ভাস্কর হতে চান। ত্যাগ নয়, সবকিছুর মধ্যে থেকেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা তাঁর বাসনা। এভাবেই তাঁর কাছে মোহ নেবে মুক্তির পথ, প্রেম নেবে ভক্তির পথ।

Scanned with CamScanner

❑ **ভাষা ও ছন্দবিচারঃ** ১৪টি পংক্তি যুক্ত যে শত কবিতার সমষ্টি 'নৈবেদ্য', এটি তার অন্যতম একটি কবিতা। তবে এখানে তিনটি স্তবক রয়েছে। প্রথম স্তবকে আটটি পূর্ণ ও একটি অর্ধ পংক্তি রয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকে একটি অর্ধ ও তিনটি পূর্ণ স্তবক রয়েছে। অভিনব, যে দুটি অর্ধ স্তবক মিলে চোদ্দটি মাত্রাই হচ্ছে এবং তা একটি পংক্তিরই সমান। উপসংহারে দুটি পংক্তি নিয়ে একটি স্তবক যা ভাবের দিক থেকেই খন্ড কবিতাটিকে তার পরিণতিতে পৌঁছে দিচ্ছে। আঙ্গিকের এই প্রভেদটুকু বাদে ছন্দে কবিতাটির পৃথক কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তানপ্রধান ছন্দে চতুর্দশপদী কবিতা এটি। প্রতি পংক্তিতে যতি-চিহ্নের আবির্ভাব প্রথমে আট মাত্রার পরে ও পরে ছয় মাত্রার পরে। ভাবের প্রবহমানতা এই কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। চরণান্তিক মিল দেখা যায় কিন্তু প্রতি পংক্তিতে ভাব সম্পূর্ণ হয়েছে তা নয়।

❑ **সারসংক্ষেপঃ** মুক্তির জন্য বৈরাগ্য গ্রহণ একটি প্রাচীন পদ্ধতি। কিন্তু কবির কাছে তা আদর্শ নয়। তিনি সংসারের অসংখ্য বন্ধনের মাঝে থেকেই মুক্তির স্বাদ পেতে চেয়েছেন। বস্তুত কবির পক্ষে জনমানব বর্জিত কোন স্থান ঈশ্বর সাধনার ক্ষেত্র হতে পারে না। মানুষের উপস্থিতির মধ্যে, মানুষের স্নেহ ভালবাসার মাঝখানে থেকেই কবি আনন্দের সঙ্গেই মুক্তির স্বাদ লাভ করতে পারবেন। মাটির ছোঁয়া লাগা সাধারণ মানুষ এবং স্বাভাবিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত থেকেই তিনি অমৃত সিঞ্চন করে নেবেন। তিনিই জ্বালাবেন মানবতার আলো। সমগ্র সংসার তাতে আলোকিত হয়ে উঠবে। বিশ্ব জুড়ে স্বয়ং ঈশ্বরের বাসভূমি, তাঁর মন্দির। আর সেই মন্দিরেই কবি জ্বালাবেন লক্ষ আলোক প্রদীপ। যাঁরা যোগী পুরুষ তাঁরা প্রত্যক্ষ জীবনের যে ভোগ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা তাকে অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও যে জ্ঞান লাভ সম্ভব, তা তাঁরা স্বীকার করেন না। কবি সে পথের পথিক নন। পৃথিবীর সব দৃশ্য-গন্ধ-গানে উপস্থিত থেকেই তিনি ঈশ্বরকে স্মরণে রাখতে চান। তার মাঝখানেই ঈশ্বরের আনন্দকে পেতে চান। সাংসারিক ক্ষেত্রে মোহ মানুষকে জালের মতো আবদ্ধ করে। কিন্তু কবি এই জালে আবদ্ধ থেকে যেতে চান না। তাই সংসারকে অস্বীকার না করলেও মোহকেই তিনি মুক্তির পথ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। প্রেমকে তিনি স্নেহের বন্ধন হিসাবে দেখতে চান না। বরং প্রেমই ভক্তির রূপ গ্রহণ করে ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ হিসাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner